ভগিনী নিবেদিতা

নিতাই বসু

GRANTHA TIRTHA CALCUTTA

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ ১ ॥

নিবেদিতাকে নিয়ে কথা হচ্ছিল স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সঙ্গে ভরত মহারাজের।

নিবেদিতা অনেকদিন পরে বেলুড় মঠে এসেছেন। তিনি নৌকোয় চড়ে এসেছেন। বেলুড়ে পৌঁছে তাঁর ইচ্ছে হল ঠাকুরঘরে যাওয়ার। নৌকোর মাঝিদেরও ইচ্ছে হল তারা ঠাকুরঘরে যাবে। কথাটা তারা কাউকে বলতে পারছে না।

তাদের ইতস্তত করতে দেখে নিবেদিতার চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোল। তিনি বজ্রকণ্ঠে ওদের বললেন, বল কী! এ স্বামীজির জায়গা। অবারিত দ্বার। এখানে সবাই আসবে, বিশেষ করে যারা পতিত, যারা দরিদ্র, অসহায়।

এমনিভাবে সেদিন তিনি বিবেকানন্দ-দর্শনের মূল বক্তব্য ওদের কাছে বলে ওদের নিয়ে ঠাকুরঘরে গিয়েছিলেন।

আর একবার :

জগদীশচন্দ্র বসু, স্বামী শঙ্করানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নিবেদিতা গিয়েছিলেন গয়াতে বৌদ্ধমন্দির দেখতে।

ফেরার সময় ওঁরা কলকাতার দিকে আসছেন। ওঁরা প্রথম শ্রেণিতেই উঠেছিলেন। এরপরেই ওই কামরায় কয়েকজন ব্রিটিশ

সেনা উঠেছে। তারা শ্বেতকায় গার্ডকে ডেকে বলল, এখনই এদের এই কামরা থেকে নামিয়ে দাও। এরা আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। গার্ড ওদের কথা শুনে এঁদের নামিয়ে দিল।

নিবেদিতা তাই দেখে বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, এত বড়ো স্পর্ধা তোমাদের! গার্ড নিবেদিতার ওই অগ্নিশিখার মতো চেহারা দেখে ভয়ে-ভয়ে আবার ওঁদের ওই কামরায় উঠতে বললেন। রবীন্দ্রনাথ তাই অনেকবার বলেছেন, ভারতবর্ষকে কে আমাদের চেনাল, কে আমাদের চোখ খুলে দিল? সে নিবেদিতা।

নিবেদিতা জানতেন, ভারতের দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অপরিচ্ছন্নতা, আচার-ব্যবহারের ত্রুটি — এগুলো কিছু নয়, এটা ভারতবর্ষের বাইরের রূপ। কিন্তু ভারতের আসল রূপ হচ্ছে ত্যাগ, তপস্যা, প্রেম, পবিত্রতা, ক্ষমা, নিঃস্বার্থপরতা। বস্তুত ভারতের জন্য তাঁর আত্মনিবেদন এতই আন্তরিক, সর্বাঙ্গীণ ও পরিপূর্ণ যে তাঁকে কোনো ভারতীয় বিদেশি বলে ভাবতেই পারেন না। তিনি কখনও 'ভারতের প্রয়োজন', 'ভারতের নারী' বলতেন না, বলতেন 'আমাদের প্রয়োজন', 'আমাদের নারী'।

দৃষ্টিভঙ্গির বিচার করলে নিবেদিতা আদ্যন্ত ভারতীয়। একবার তিনি স্কুলের মেয়েদের জিজ্ঞেস করেছেন, ভারতের রানি কে? সকলে সমস্বরে বলে উঠল, কুইন ভিক্টোরিয়া। নিবেদিতা সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, সে কী? তিনি কেন তোমাদের রানি হতে যাবেন? তোমাদের রানি সীতা, তিনি তোমাদের চিরকালের রানি।

আর একটি ঘটনা। সেবার লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে। সেখানে তিনি গেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে। সকালে তিনি একা-একা হাঁটতে বেরিয়েছেন। কোনো বিদেশি বা বিদেশিনীকে একাকী রাস্তায় হাঁটতে দেখলে আমাদের দেশের রীতি অনুযায়ী অনেক লোক নিবেদিতার পাশাপাশি হাঁটছে। নিবেদিতা তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন।

রাস্তার পাহারাওয়ালা পুলিশ ভাবল, মেমসাহেবের নিশ্চয়ই প্রচণ্ড অসুবিধে হচ্ছে, এরা সবাই তাঁকে প্রচণ্ড বিরক্ত করছে। সে এসে সবাইকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, ভাগো হিয়াঁসে।

নিবেদিতা দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং পুলিশকে বললেন, এরা সব আমার লোক এবং এরা আমার সঙ্গেই যাবে। পুলিশ অবাক হয়ে মেমসাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকল।

নিবেদিতার ভারতপ্রেম যে কত গভীর ও গাঢ় ছিল, তার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে। ওই চিঠিতে তিনি লেখেন, 'কলকাতায় আসার পর আমি অধ্যাপক (জগদীশচন্দ্র) বসু ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে। মহা আতঙ্কের সঙ্গে তখন দেখেছিলাম — এইরকম বিরাট বিজ্ঞানকর্মীকে কী ধরনের ধারাবাহিক অসুবিধার ও উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হয় এবং সেইসব অসুবিধা ঘটাচ্ছেন তাঁরাই যাঁদের একান্ত ইচ্ছা তাঁর সাফল্যের অবসান হোক, কারণ ব্যাপারটা তাঁদের কাছে গাত্রদাহকর।'

১৯০৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে লর্ড কার্জন বক্তৃতা করতে গিয়ে প্রচণ্ড বিদ্বেষবশত প্রাচ্য দেশবাসীদের মিথ্যেবাদী বলে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করলেন। এই অশালীন হীনতা নিবেদিতার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হল না। তিনি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে টানতে-টানতে উত্তেজিতভাবে সভা ছেড়ে বেরিয়ে সোজা চলে গেলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে। সেখানে গিয়ে কার্জনের 'প্রবলেম অব দ্য ফার ইস্ট' গ্রন্থ খুলে দেখিয়ে দিলেন, কার্জন কোরিয়ায় গিয়ে যেসব মিথ্যে কথা বলেছিলেন তার সাতকাহন বর্ণনা। শুধু ওখানেই ক্ষান্ত হলেন না নিবেদিতা। তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় এক বে-নামা লেখায় কার্জনের মন্তব্যের বিরূপ সমালোচনা করেন। এতে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জগদীশচন্দ্র নিবেদিতাকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন, 'বজ্র

যেমন সবসময় কালো মেঘের পিছনে থাকে যাতে করে আকাশের কোন্ অংশ থেকে তা নিক্ষিপ্ত হল তা কেউ বুঝতে পারে না, আপনার মন্তব্য সেইভাবে আঘাত হেনে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিহ্বল ও বিমূঢ় করে দিয়েছে।'

ভগিনী নিবেদিতা গুরু বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণের আদর্শকে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন। রামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ ছিল ত্যাগ ও সেবা। নিবেদিতার জীবন সেবা ও আত্মদানমূলক তপস্যার জীবন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর যে ঐকান্তিকতা তা তাঁর ত্যাগ ও সেবার মধ্য দিয়েই সার্থক হয়ে উঠেছে। নিবেদিতা স্বদেশ, স্বজাতি, স্বজন ছেড়ে এ-দেশে এসে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

ভালোবাসায় ভরা ছিল তাঁর জীবন। সেই ভালোবাসায় কোথাও কোনো উগ্রতা নেই। স্নিগ্ধ শান্তির মতো তা সকলের কল্যাণ নিয়ে আসে। তাঁর কর্মসাধনা ভারতমাতার অক্ষয় সম্পদ। এ-দেশের নারীশিক্ষার ইতিহাসে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষার পূর্ণ পরিণতি সেবায় ও আত্মত্যাগে। তিনি আজীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করে এবং দেশ-দেশান্তরের বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, ভারতীয় নারীর শিক্ষায় তা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে তিনি তার সার্থক রূপায়ণ করেছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধেও নিবেদিতার আদর্শ তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শেরই অনুরূপ। ভারতের কোমলপ্রাণ নারী-জাতির অজ্ঞতা ও দুর্বলতা-দর্শনে নিবেদিতা ব্যথিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন, একটা জাতিকে যদি বাঁচতে হয়, তবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সমবেত শিক্ষা ও শক্তির সাহায্যেই তা সম্ভব হবে। মাতৃজাতির প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে ভারতমাতার রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হবে না। নারীজাতিকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে আমরা যেদিন তাকে গৌরবাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারব সেইদিন ভারতমাতার শত-শতাব্দীর অজ্ঞান-

অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হবে, প্রভাতসূর্যের বিমল কিরণে মাতৃমন্দির উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, জাগরণের ঊষাদীপ্তি উজ্জ্বল হবে। তখনই সুজলা-সুফলা ভারতমাতার বিশাল প্রাঙ্গণে সহস্র নারীকণ্ঠে শৌর্যবীর্য গাথা ধ্বনিত হবে।

অতীতের হিন্দু নারীগণ কি আমাদের লজ্জার কারণ ছিলেন যে, তাঁদের প্রাচীন সৌন্দর্য ও মাধুর্য, তাঁদের নম্রতা ও ধর্মভাব, তাঁদের সহিষ্ণুতা এবং প্রেম ও করুণা বর্জন করে আমরা পাশ্চাত্যের বিবিধ তথ্য সংগ্রহ, সামাজিক উদ্দামতার যা প্রথম অপরিণত ফল, তাই গ্রহণ করতে ব্যগ্র হব? যে শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ সাধন করতে গিয়ে নম্রতা ও কমনীয়তা বিনষ্ট করে তা প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না। সুতরাং ভারতীয় নারীগণের জন্য এমন একটি শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন, যার লক্ষ্য হবে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির পরস্পরের সহযোগিতায় বিকাশ সাধন। তাই তিনি আত্মপ্রচেষ্টা বা আত্মনির্ভরতাকে জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের মূল পদক্ষেপ বলে মনে করতেন।

ড. নিমাইসাধন বসু বলেছেন, 'নিবেদিতা জন্মসূত্রে ভারতীয় ছিলেন না। কিন্তু মনে-প্রাণে সকল কর্মে ও চিন্তায় নিবেদিতার থেকেও বড়ো দেশপ্রেমিক ভারত-কন্যা জন্মগ্রহণ করেননি। ভারতের প্রতি নিবেদিতপ্রাণই শুধু নয়, ভারতবর্ষের সার্বিক কল্যাণ, অগ্রগতি ও পুনর্জাগরণের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করেই তিনি এই দেশে এসেছিলেন। ভারতের মাটিতে তিনি সর্বসাকুল্যে ছিলেন মাত্র এক দশকের কিছু বেশি সময়। তারই মধ্যে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের ও মননের এমন কোনো ক্ষেত্র ছিল না যেখানে তিনি দাগ রেখে যাননি।'